শেরপুরের শিক্ষা ব্যবস্থা

সুদূর অতীতকালে এদেশে শিক্ষা বিস্ত্মারের যে ব্যবস্থা হয়েছিল তা তপোবন, গুরুগৃহ ,টোল, মন্দির, মসজিদ , মক্তব ও মাদরাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । এসব প্রতিষ্ঠান ছিল ধর্মীয় মূল্যবোধাক্রান্ত্ম । বিদেশিদের কাছে এই শিক্ষা ব্যবস্থা দেশজ শিক্ষা নামে অভিহিত। কাল পরিক্রমায় ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে শিক্ষার ধারায় বিচিত্র প্রবাহ যুক্ত হয়। পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে ভারতে পর্তুগিজদের আগমনের পর (১৪৯৮) একে একে ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজ এবং দিনেমার বণিক সংস্থা বানিজ্যের উদ্দেশ্যে এদেশে আসে । এদের সাথে আসে ইউরোপের বিভিন্ন মিশনারি দল। মিশনারি দলগুলোর কোনোটি প্রটেস্ট্যান্ট , কোনোটি ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলো। তাদের আগমনের উদ্দেশ্য ছিলো নাবিকদের ধর্মীয় মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রাখা এবং নতুন ভুখন্ডের খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার করা । কিন্তু শিক্ষার প্রসার ছাড়া একাজ কোনো ক্রমেই সম্ভব নয় , তা তারা হাড়ে হাড়ে জানতো । তাই তাদেরই প্রচেষ্টায় ভারতীয় ভূ- খন্ডে সূচিত হলো নতুন শিক্ষা পরিবেশ। ওরা দেশজ শিক্ষাকে অবহেলা না করে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অনুকূলে নতুন নতুন অনুগামী সংগ্রহ করার জন্য ধর্মান্ত্মরিত করার ব্রত অবলম্বন করে । এজন্য তারা দেশীয় লোকদের বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র ও পুস্ত্মকাদি বিতরণ করে প্রভাবিত ও প্রলোভিত করতো । ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা বিস্ত্মার এ দু'টির মধ্যে ছিল অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ।

ইংরেজরা এদেশের ক্ষমতা দখলের পর শাসন শোষণের পথকে আরো সহজ করার, ধর্ম প্রচার এবং এদেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হওয়ার জন্য কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়াবার প্রয়োজন অনুভব করলেন। পাদ্রী, মিশনারিরা শিক্ষাদানের পাশাপাশি ধর্ম প্রচারে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে দেশীয় মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুললে কোম্পানী কর্তৃক কিছু নতুন নীতি গ্রহণ করা হয় ঃ

১) স্থানীয় হিন্দু মুসলমানদের সন্তুষ্ট রাখা এবং

২) মিশনারিরা যাতে ধর্মান্ত্মরকরণের প্রবণতা নিয়ে হিন্দু মুসলমানদের শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্মের ওপর আঘাত না হানে এবং ভারতীয়দের মাঝে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি না করে সে দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা ।

এরকম প্রেক্ষাপটেই ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে ''রেগুলেটিং এ্যাক্ট'' প্রবর্তন করা হল। এই আইনে বলা হল যে , হিন্দু ও মুসলিম আইন অনুসারে যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানদের বিচার করা হবে। সুতরাং ইউরোপীয় বিচারকের কাছে হিন্দু ও মুসলমান আইন ব্যাখ্যাকারী প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ''কলকাতা মাদরাসা'' এবং বারানসির ''সংস্কৃত কলেজ'' প্রতিষ্ঠার পেছনে এ কারণটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের প্রথমটিতে মুসলমানদের ধর্মীয় এবং দ্বিতীয়টিতে হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রীয় বিষয়াদি পড়ানো হতো । আশা করা হতো যে, কলকাতা মাদরাসা ও সংস্কৃত কলেজ হতে পাশ করা ছাত্ররাই যথাক্রমে মুসলমান আইন ও হিন্দু আইন সংক্রান্ত্ম ব্যাপারে বিচারকদের সাহায্য করতে পারবেন। '' (যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ - মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী)।

লর্ড ওয়েলেসলি ভারতের গভর্নর' জেনারেল হয়ে এসে লক্ষ্য করলেন , ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম নির্বাহ কবার এবং দেশীয় শাসন চালানোর জন্য বিলেত থেকে যে সমস্ত্ম '' আহেলা'' সিভিলিয়ান কর্মচারীরা আসতেন, বয়সে তারা ছিলেন অতি নবীন , বালখিল্য বলা যেতে পারে । তারা বিলেত থেকে যখন আসতেন তখন নিজেদের ভাষাও ভালো করে শিখতেন না; যে দেশ শাসন করবার জন্য তাঁরা প্রেরিত হতেন , সে দেশ সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ । তাই সুশাসনের জন্য ওয়েলেসলি মনে করলেন এদেশে এমন একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার যেখানে তরুন সিভিলিয়ানেরা পড়াশুনা করে এদেশের ভাষা, ভাষা, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, আইন কানুন প্রভৃতি শিখবেন। এর জন্য ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা লালবাজারের কাছ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন যদিও এর সঙ্গে বাঙ্গালীদের যোগ ছিল না । উল্লোখ্য এ কলেজে বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাসহ সংস্কৃত, উর্দু , ফারসী প্রভৃতি ভাষা শেখারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল ।

সে সময় সনাতনী পাঠশালার শিক্ষার চিত্র ছিলো অতীব করুণ । শিক্ষার নামে কোমলমতি শিশুদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ও উৎপীড়ন করা হতো । সে যুগের শিক্ষা চিত্রের এক প্রামাণ্য দলিল শিবনাথ শাস্ত্রীর ''রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ'' । ঐ গ্রন্থ থেকে দু'একটি চিত্র' তুলে ধরছি '' বর্দ্ধমান জেলা হইতে কায়স্ত্ম জাতীয় গুরুগন আসিতেন । তাঁহারা আসিয়া কোনও ভদ্র গৃহস্ত্মের গৃহে, বাহিরের চন্ডীমন্ডপে পাঠশালা খুলিতেন। প্রাতে ও অপরাহ্নে পাঠশালা বসিত । একমাত্র শিক্ষক গুরুমহাশয় বেত হস্ত্মে মধ্যস্থলে একটি খুঁটিতে ঠেসান দিয়া বসিয়া থাকতেন। সর্দ্দার পড়ুয়ারা অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর বালকেরা সময়ে শিক্ষকতা কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিত । বালকেরা স্বীয় স্বীয় মাদুর পাতিয়া বসিয়া লিখিত । লিখিত এই জন্য বলিতেছি, তৎকালে পাঠ্যগ্রন্থ বা পড়িবার রীতি ছিল না । কিছুদিন পাঠশালে লিখিয়া ব্রাহ্মণ পন্ডিতের সন্ত্মানগন টোলে গিয়া ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিত, এবং য াঁহারা সন্ত্মানদিগকে রাজকার্য্যের জন্য শিক্ষিত করিতে চাহিতেন , তাঁহারা তাহাদিগকে ফারসী পড়িতে দিতেন। যাহারা জমিদারী সরকারে কর্ম করিতে বা বিষয়ে বানিজ্য নিযুক্ত হইতে চাহিত তাহারাই শেষ পর্যন্ত্ম গুরু মহাশয়ের পাঠশালে থাকিত।"

পাঠশালাগুলোর পরিচালনা ও শিক্ষারীতি সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বর্ণনা দিয়েছেন,"পাঠশালে পাঠানোর রীতি এই ছিল যে, বালকেরা প্রথমে মাটিতে খড়ি দিয়া বর্ণ পরিচয় করিত, পরে তালপত্রে স্বরবর্ণ , যুক্তবর্ণ ,শটিকা, কড়াকিয়া , কুড়িকিয়া প্রভৃতি লিখিত , তৎপর তালপত্র হইতে কদলী পত্রে উন্নীত হইত ; তখন খেরজ , জমাখরচ, শুভঙ্করী , কাঠাকালী , বিঘাকালী প্রভৃতি শিখিত ; সর্বশেষে কাগজে উন্নীত হইয়া চিঠিপত্র লিখিতে শিখিত। "

পাঠশালায় ছাত্রদের শাস্তির ব্যবস্থা ছিলো নির্মম ও মর্মস্পর্শী । " উঠিতে বসিতে , নড়িতে চড়িতে গুরুমহাশয়ের বেত্র তাহাদের পৃষ্ঠে পড়িত " (প্রাগুক্ত)। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়াম এ্যাডমকে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে বলেন। এ্যাডামের রিপোর্টে ১৪ প্রকার লোমহর্ষক ও পাশবিক সাজার বর্ণনা আছে। কোমল মতি শিশু কিশোর শিক্ষার্থীরা এই নির্মম ভয়াবহ ও পাশবিক শাস্তির ভয়ে পাঠশালায় আসতে চাইতো না- অনেকে এসেও পালিয়ে যেতো ।

"দেশীয় শিক্ষার যখন এই করুন অবস্থা ঠিক এমনি পরিবেশেই ধীরে ধীরে আধুনিক ও উন্নতমানের পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে উঠে ডেভিড হেয়ার, ডেভিড ড্রামন্ড ও জন গ্রান্টের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় । এ দেশে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য তাঁরা অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন।" (ডিরোজিও : জীবন ও সাহিত্য ড. মফিজউদ্দিন আহমদ)।

দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা যুগের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলাতে না পারায় মুখ থুবড়ে পড়ে। সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর পাদটীকা গল্পে চিত্রটি এভাবে তুলে ধরেন " গত শতকের শেষ আর এই শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশের টোল গুলো মড়ক লেগে প্রায় সম্পূর্ণ উজার হয়ে যায় । পাঠান মোগল আমলে যে দুর্দৈব ঘটেনি ইংরেজ রাজত্বে সেটা প্রায় আমাদের চেখের সামনে ঘটল । অর্থনৈতিক চাপে দেশের কর্তা ব্যক্তিরা ছেলে ভাইপোকে টোলে না পাঠিয়ে ইংরেজি স্কুলে পাঠাতে আরম্ভ করলে চতুর্দিকে ইংরেজি শিক্ষার জয় জয়কার পড়ে গেল- সেই ডামাডোলে বিস্মৃর টোল মরল, আর বিস্মৃর কাব্যতীর্থ বেদান্তবাগীশ না খেয়ে মারা গেলেন।"

মাদরাসা শিক্ষাও ছিলো। টোলের মতো করুণ । শিক্ষার আধুনিকীকরণের আওতায় কিছু মাদরাসা প্রতিষ্টিত হয়ে গেলো, বাকী কিছু মক্তব মাদরাসা যুগের চাহিদা মিটানোর জন্য স্কুলে পরিণত হলো বাকী সব সনাতনী ব্যবস্থা ধরে রাখলো'। টোল গেলো হারিয়ে।

শিক্ষার চিত্র বিচিত্র ঃ সনাতনী শিক্ষা ব্যবস্থার বিপরীতে দেশময় আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত ঘটার অল্প কিছুকাল পরেই শেরপুরে দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিক্টোরিয়া একাডেমী ও গোবিন্দকুমার পিস মেমোরিয়াল (G.K.P.M) ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় । এ প্রসঙ্গে হরচন্দ্র চৌধুরী তাঁর "সেরপুর বিবরণী" গ্রন্থে উল্লোখ করেন। "সহর সেরপুর ইংরেজী ও বাঙ্গালা শিক্ষার নিমিত্ত দুইটি বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে একটি গবর্নমেন্ট সাহায্যকৃত ও অন্যটি প্রাইভেট। সরকারী স্কুলটি ১৮৫৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী ও বেসকারী স্কুলটি ১৮৭০ সালের ১২ ডিসেম্বর স্থাপিত। গোবিন্দ কুমার চৌধুরী বেসরকারী স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা। উল্লোখ্য এই ইংরেজি স্কুলটিই ভিক্টোরিয়া একাডেমী। প্রথমে এটি মাইনর স্কুল ছিলো। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে তা ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে হাইস্কুলে উন্নীত হয়।হরচন্দ্র চৌধুরী, ছেলে চারুচন্দ্র চৌধুরী, হেমাঙ্গ চন্দ্র চৌধুরী ও হিরণ চন্দ্র চৌধুরী ভিক্টোরিয়া একাডেমীর উন্নতিকল্লো প্রভূত সাহায্য সহযোগিতা করেন। অন্যদিকে গোবিন্দ্র কুমার পিস মেমোরিয়াল (G.K.P.M) ইনস্টিটিউট এর প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং গোবিন্দ কুমার চৌধুরী। এই প্রতিষ্ঠানটির পেছনে উল্লোখযোগ্য আর্থিক অবদান রাখেন গোপাল দাস চৌধুরী, সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী, সতীন্দ্র মোহন চৌধুরী প্রমুখ।

জেলার কিছু পুরানো প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লোখ করা যেতে পারে, যেমন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, শেরপুর উপজেলা (১৯০২) যোগনীমুরা উচ্চ বিদ্যালয়, শেরপুর উপজেলা (১৯১২)- চন্দ্রকোনা রাজলক্ষী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৯) নকলা, ধুকুরিয়া আফজালুন নেছা বালিকা বিদ্যালয়(১৯২২), গণপদ্দি উচ্চ বিদ্যালয়(১৯৩৯) নকলা, হিরম্ময়ী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৯) নালিতাবাড়ী, টেঙ্গরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৪০) শ্রীবরদী, শ্রীবরদী এ,পি, পি, আই (১৯৪৫) শ্রীবরদী, কাকিলাকুড়া ফাজিল মাদরাসা (১৯৫০) শ্রীবরদী, ঝিনাইগাতী মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৩৮) ঝিনাইগাতী, দিঘীরপাড় আলিম মাদরাসা (১৯৬২) ঝিনাইগাতী ইত্যাদি ।

২০০১ খ্রীস্টাব্দের আদম শুমারী অনুযায়ী শেরপুর জেলার শিক্ষার হার ৩১% ।

জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

১. কলেজ ঃ ১৮টি (৩টি সরকারী ও ৪টি কারিগরীসহ)।
২. হাই স্কুল ঃ ১৩৯টি (সরকারী ৩টি) ।
৩. মাদরাসা ঃ ৮৫টি (দাখিল , আলিম ,ফাজিল ও কামিলসহ)।
৪. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ৩৮৫টি।
৫. রেজিস্টাড প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ২৪৮টি।
৬. ব্র্যাক পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ ৩৯৭টি।
৭. রস্ক প্রকল্প (রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রজেক্ট) আনন্দ স্কুল ঃ ৩৪৭টি।
৮. ব্র্যাক পরিচালিত প্রি-প্রাইমারী স্কুল ঃ ৫৮৮টি।
৯. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ঃ ১টি ।

এ ছাড়া প্রাইভেট স্কুল, কিন্ডার গার্টেন, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদরাসা, কওমি মাদরাসা, হেফজখানা ও মসজিদভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কম নয়।

পর্যায়ক্রমে এ জেলায় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সংখ্যা কম নয়। শিক্ষার হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ সব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও কম নয়। এ জেলায় বেশ কিছু প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান রয়েছে । এগুলো সাধারণত শহর কেন্দ্রিক। এসব প্রতিষ্ঠানে সচেতন ও সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত । ফলে অভিভাবকদের অনেক টাকা গুনতে হয়। এসব প্রতিষ্ঠান সরকার অনুমোদিত নয় বলে ছাত্র-ছাত্রীদের অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে রেজিস্ট্রেশন ও ফরম পূরণ করে বোর্ড পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্ডারগার্টেন অনেকটা প্রাইভেট স্কুলের মতোই ব্যয়বহুল ।

দু'ধরণের কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। একটি হচ্ছে । দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত এবং অন্যটি হচ্ছে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত । দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলে একজন শিক্ষক এবং পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলে চারজন শিক্ষক শিক্ষাদান করে । উল্লোখ্য কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা মাসে ১২০০/- টাকা বেতন পান। স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদরাসা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমান হলেও এবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন মাত্র ৫০০/- টাকা । এসব মাদরাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা দেয়া হয়। অন্যদিকে কওমি মাদরাসা , হেফজখানা ও মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মূলত ঃ ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয়।

শিক্ষা বিস্তারে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও ভূমিকা রেখে যাচ্ছে । ব্র্যাক পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় তার মধ্যে অন্যতম । ব্র্যাকের নিজস্ব তদারকিতে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। তবে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাত্র এক জন শিক্ষককেই এখানে পাঠদান করতে হয় বলে বিষয়টি ভাবনার উদ্রেক করে বৈকি । অন্যদিকে ব্র্যাক পরিচালিত প্রি প্রাইমারী স্কুল শিশুদের প্রাইমারী স্কুলে যাবার যোগ্যতা তৈরির ক্ষেত্রে ভালো ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

শেরপুর জেলার মধ্যে মাত্র দু'টি উপজেলায় (শেরপুর উপজেলা ও শ্রীবরদী উপজেলা) দাতা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত এবং সরকারী তদারকিতে বিভিন্ন কারণে ঝরে পড়া ছেলে মেয়েদের জন্য ৩৪৭টি আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি একটি পরীক্ষা মূলক প্রকল্প । প্রকল্পটির ফলাফল ইতিবাচক হলে সকল উপজেলায় চালু করা হবে।

প্রথমে যখন উপবৃত্তি চালু হলো তখন এই দারিদ্র কবলিত এলাকার ছেলে মেয়েদের জন্য এক সু- সংবাদই বয়ে এনেছিলো । ফলে প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীর উপস্থিতি ছিলো উল্লোখযোগ্য। অন্তত্বতঃ উপবৃত্তির জন্য হলেও তারা প্রতিষ্ঠানমুখী এবং এস এস সি পর্যন্ত তারা প্রতিষ্ঠানে থাকায় বাল্য বিবাহও হ্রাস পেয়েছিলো ব্যাপকভাবে। পরবর্তীকালে যখন ১০০% থেকে নামিয়ে ৩০% ছাত্রীর উপবৃত্তি দেওয়া শুরু হলো তখন থেকে মেয়েদের উপস্থিতিও কমতে থাকলো । আর ১০% ছাত্রের উপবৃত্তি দেওয়া হয় । এ সংখ্যাটি হত দরিদ্র ছাত্রের সংখ্যার চেয়ে অনেক কম।

ইদানিং রাস্তার মোড়ের দোকান , গ্রামের বাজারে দোকানে দোকানে টিভি, ভিসিভি চলায় কোমলমতি শিশু , কিশোররা প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে সে সব স্থানে ভিড় করে । পর্যায়ক্রমে তারা প্রতিষ্ঠান বিমুখ হয়ে পড়ে । তার উপর নতুন করে যোগ হয়েছে মোবাইল বিনোদন । প্রাথমিক শিক্ষা সরাব জন্য বাধ্যতামূলক হলেও তা কার্যকর । সম্ভবও হয় নি নানা কারণে । শিশু শ্রম আইনত নিষিদ্ধ হলেও তা-ই বা কতোটুকু ঠেকানো সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের রয়েছে বিরাট ভূমিকা। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে রকম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেরকম ভাবে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। খান বাহাদুর ফজলুর রহমান জেলা সরকারী গণগ্রন্থাগার নামে জেলায় মাত্র একটি গণগ্রন্থাগার রয়েছে । উপজেলাগুলোতে সরকারী গণগ্রান্থগার না থাকাটা সত্যিই এক বিরাট অপূর্ণতা । কিছু প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য গ্রন্থাগার রয়েছে। ব্র্যাকের সহায়তায় কিছু প্রতিষ্ঠানে ব্র্যাক গণকেন্দ্র পাঠাগার রয়েছে যা ছাত্র ছাত্রীদের পশাপাশি সাধারণ মানুয় ও ব্যবহার করতে পারছে।

দেশের একটি প্রত্যন্ত জেলার নাম শেরপুর জেলা। এ জেলার পাঁচটি উপজেলার মধ্যে তিনটি উপজেলাই সীমান্তবর্তী উপজেলা । ভৌগোলিক , ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক কারণেই শেরপুর জেলায় শিক্ষার হার নিম্ন। উন্নয়নের ছোঁয়া লাগতে এবং শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে মাঝখানে কেটে গেছে অনেক বছর । পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার দিকে তাকালেও বিষয়টি পরিস্কার বুঝা যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতি , দারিদ্র , অসচেনতা, অনিচ্ছা, কুসংস্কার ইত্যাদি কারণেই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো অনেক পিছিয়ে । কালের প্রবাহে প্রেক্ষাপট পাল্টেছে। আকাঙ্খার পালে লেগেছে নতুন যুগের হাওয়া। আর তাই পশ্চাৎপদ এ জনপদে পরবর্তীকালে শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তবে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি সনাতনী শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তার এ জেলায় যতোটা হয়েছে তা যুগের সাথে কতোটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা ভেবে দেখা দরকার । কেননা - " অর্জিত বিদ্যার ও জ্ঞানের প্রয়োজনীয় অংশ বোধ বুদ্ধির আয়ত্তে এনে জীবনচর্চার অন্তর্গত করে নিতে না জানলে বা না নিলে মানুষ শিক্ষিত হয় না । শিক্ষা মানুষের রুচি করে পরিস্রুত, বুদ্ধি করে তীক্ষ্ণ , মন করে পরিচ্ছন্ন, মনন করে মার্জিত ও বিন্যস্ত । অতএব শিক্ষা পরিশীলন ও পরিস্রুতির মাধ্যমে ও বাহন। লেখা পড়াই তাই মন- বুদ্ধি - আত্মার পরিমার্জনা ও বিকাশের উৎকৃষ্ট পন্থা বলে বিবেচিত ।" (নির্বাচিত প্রবন্ধ, ড. আহমদ শরীফ) ।

শেরপুর জেলায় এক নজরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য (মাদ্‌রাসা ও কারিগরি স্কুল ও কলেজ)

উপজেলার নাম	দাখিল মাদ্‌রাসার সংখ্যা			আলিম মাদ্‌রাসার সংখ্যা			ফাজিল মাদ্‌রাসার সংখ্যা			কামিল মাদ্‌রাসার সংখ্যা			সর্বমোট মাদ্‌রাসা	স্বতন্ত্র এবং মাদরাসা	কারিগরী কলেজ			কারিগরী স্কুল এন্ড কলেজ	স্কুলের সংযুক্ত ভোকেশনাল স্কুল
	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট			সরকারী	বেসঃ	মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
শেরপুর সদর	২২	–	২২	০৪	--	০৪	–	০১	০১	--	--	--	২৭	১৪	Ag-১ Pc-১	০৪	০৬	০১	০২
নালিতাবাড়ী	১৪	–	১৪	০৪	০১	০৫	০২	--	০২	--	--	--	২১	১৪	--	০২	০২	--	০২
নকলা	১৪	০২	১৬	০২	--	০২	০১	--	০১	--	--	--	১৯	০৫	--	০১	০১	--	০২
শ্রীবর্দী	১৪	–	১৪	০৪	--	০৪	০২	--	০২	০১	--	০১	২১	২৯	--	০১	০১	--	০২
ঝিনাইগাতী	১৩	–	১৩	০১	--	০১	–	--	–	--	--	--	১৪	০৯	--	০২	০২	--	০১
সর্বমোট	৭৭	০২	৭৯	১৫	০১	১৬	০৬	--	০৬	০১	--	০১	১০২	৭১	০২	১০	১২	০১	১০

(১) পলিটেকনিক্যাল কলেজ ঃ ০১টি

(২) কৃষি ডিপ্লোমা কলেজ ঃ ০১টি

(৩) সেবা ইন্সটিটিউট ঃ ০১টি

(৪) কারিগরি স্কুল এন্ড কলেজঃ ০১টি

(৫) হোমিওপ্যাথিক কলেজ ঃ ০১টি

শেরপুর জেলায় এক নজরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য (স্কুল ও কলেজ)

ক্রমিক	উপজেলার নাম	সরকারী কলেজ সংখ্যা			বেসরকারী কলেজ সংখ্যা			সর্বমোট কলেজ	সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা			বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা			নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা			সর্বমোট স্কুল
		বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট		বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট	
০১	শেরপুর সদর	০১	০১	০২	০৩	০১	০৪	০৬	০১	০১	০২	৪২	০৬	৪৮	০৫	০৩	০৮	৫৮
০২	নালিতাবাড়ী	--	--	--	০১	০১	০২	০২	--	--	--	১৯	০৪	২৩	০৮	০২	১০	৩৩
০৩	নকলা	--	--	--	০২	০১	০৩	০৩	--	--	--	২১	০৩	২৪	০৪	০১	০৫	২৯
০৪	শ্রীবর্দী	০১	--	০১	০১	--	০১	০২	--	০১	০১	২২	০২	২৪	০২	০৩	০৫	৩০
০৫	ঝিনাইগাতী	--	--	--	০২	০১	০৩	০৩	--	--	--	১৪	০১	১৫	০৫	০২	০৭	২২
	সর্বমোট	০২	০১	০৩	০৯	০৪	১৩	১৬	০১	০২	০৩	১১৮	১৬	১৩৪	২৪	১১	৩৫	১৭২